নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনী

'তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব! এই উক্তি যার কণ্ঠে উপনীত হয়েছিল, তিনি হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। বাংলার বীর সন্তান তিনি, তাঁর জন্ম ভারতবাসীর কাছে একটা উপহার। কে ভেবেছিল এই মানুষটা জন্মগ্রহণ করার ভারতবাসীর জীবনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন যে মানুষ, সেই মানুষটির সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

জন্ম :- ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি।
জন্ম স্থান :- ওড়িশা রাজ্যের কটক শহরে।
মাতা ও পিতা :- প্রভাবতী দেবী এবং জানকীনাথ বসু।
স্কুল :- প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপীয় স্কুল (বর্তমান নাম- স্টুয়ার্ট স্কুল) এবং রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল।
কলেজ :- স্কটিশ চার্চ কলেজ (ফিলোজফি-তে বি.এ. পাশ)
দাম্পত্য সঙ্গী :- এমিলি শেঙ্কল।
সন্তান :- অনিতা বসু পাফ।
প্রিয় খাদ্য :- সিদ্ধ ভাত আর তরকারি।
লিখিত বই :- 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'
সুভাষচন্দ্রের জীবনীমূলক বই :- সুভাষ ঘরে ফেরে নাই, তরুণের স্বপ্ন, নেতাজী ফিরেছিলেন, নেতাজী রহস্য সন্ধানে।
মৃত্যু :- ১৫ অগাস্ট ১৯৪৫ (অমীমাংসিত)।

জন্মবৃত্তান্ত

১৮৯৭ সালের ২৩ শে জানুয়ারি দুপুর ১২ টা বেজে ১৫ মিনিটে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ওড়িশার কটকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর বাবা মায়ের চোদ্দ সন্তানের মধ্যে নবমতম সন্তান।

মাতা ও পিতা

মাতা ছিলেন প্রভাবতী দেবী। এবং পিতা ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী জানকীনাথ বসু। মা প্রভাবতী দেবী ছিলেন কলকাতার বরানগরের মেয়ে, ১৮৮০ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে বিয়ে হয় জানকীনাথ বসুর সাথে। জানকীনাথের জন্ম চব্বিশ পরগণার কোদালিয়া গ্রামে । যা বর্তমানে সুভাষগ্রাম নামে পরিচিত। খুবই অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন জানকীনাথ। এরপর নিজের যোগ্যতায় কটক শহরে গিয়ে খ্যাতিমান উকিল হয়ে ওঠেন।

শৈশব কাল

শৈশব থেকেই মায়ের কাছে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, কথামৃত এসব শুনে বড় হয়েছেন। সুভাষ ছোটো থেকেই ছিলেন অন্যরকম। নিজের ভাবনায় সবসময় বুঁদ হয়ে থাকতেন।

শিক্ষা জীবন

১৯০২ সালে তার পাঁচ ভাইয়ের সাথে কটকের প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপীয় স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। কারণ এই স্কুল তাঁর ভালো লাগত না। সাহেবদের ছেলেদের সাথে পড়তে তাঁর ইচ্ছা করত না। তাঁর মনে হয়েছিল একটা কৃত্রিম জগতে তিনি রয়েছেন। আর তাই ১৯০৯ সালে এই স্কুল ছেড়ে দেন। স্কুল ছাড়ার পর খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। এরপর ১৯০৯ সালে ভর্তি হন কটকের রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে। এই স্কুলে আসার পর তাঁর বেশ সমস্যা হয়। সমস্যা হয় বাংলা ভাষায়। আগের স্কুলে যেহেতু বাংলা ভাষার চর্চা ছিল না, তাই বেশ অসুবিধা হয়েছিল। আর তাই সবার কাছে হাসির পাত্র হয়ে উঠেছিল। এরপর আত্মসম্মান বোধে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন বাংলা শিখবেন। আর তাই বাংলা শিখে, পরীক্ষায় সবার থেকে বেশি নম্বর পেয়ে তাঁর মেধা দেখিয়ে দিলেন। ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় এই স্কুল থেকে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করলেন।

১৯১৫ সালে সুভাষচন্দ্র বসু আই.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে মেধাস্থান অর্জন করেন। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শন শাস্ত্র নিয়ে অনার্সে ভর্তি হন। কিন্তু এই কলেজে অধ্যাপক ওটেন বাঙালী ছাত্রদের সাথে অপমানজনক ব্যবহার করেন। আর তাই সুভাষ ওটেন সাহেবের প্রতি রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করেন। আর তাই সুভাষকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি আশুতোষ

মুখোপাধ্যায়ের (স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ) সহযোগীতায় ১৯১৯ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন নিয়ে ভর্তি হন। এরপর ১৯২০ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। চতুর্থ স্থান অধিকার করে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৯২১ সালের ২২ এপ্রিল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করেছিলেন তখন বয়স ছিল মাত্র ২৪।

সুভাষচন্দ্রের খাদ্য তালিকা

তিনি ভীষণভাবে খেতে পছন্দ করতেন ভাত আর মুগ ডাল। আর মিষ্টির দিক দিয়ে রসগোল্লা, চমচম, পিঠে পুলি এবং সন্দেশ খেতে ভালোবাসতেন। এছাড়াও মনোহরা, চিনির পুলি, নারকেল নাড়ু, রসবড়া, ছাতুর বরফি ,মুরির নাড়ু, তিলের নাড়ু , তিলের চাকতি ছিল পছন্দের তালিকায়।

নেতাজীর ব্যক্তিগত জীবন

১৯৩২ এ জেলে থাকার সময়, খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন নেতাজী। তাই চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় যান। সেখানে তিনি 'দা ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' নামে বই লেখার সুযোগ পান। আর এই লেখার কাজে তিনি দুজন সহযোগীর খোঁজ করেন। যিনি ইংরেজী আর টাইপিং দুটোই জানবেন। আর এই কাজে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন ২৩ বছর বয়সী এমিলি শেঙ্কল। এই বিদেশী মহিলাকে তিনি কাজে নেন। এরপর থেকেই তাঁর জীবনে একটা নতুন ঝড় আসে। তা হল প্রেমের ঝড়। এমিলির সাথে প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ হন নেতাজী। তাদের প্রেমজ সম্পর্ক যে রূপ ছিল, তার একটি পত্র পাওয়া যায়। নেতাজী এমিলিকে লেখেন, "আমি জানি না ভবিষ্যতে কী হবে। হতে পারে, পুরো জীবনটাই হয়তো জেলে কাটাতে হবে, অথবা আমাকে গুলি করে দেওয়া হতে পারে, কিংবা ফাঁসীও হতে পারে। এও সম্ভব যে তুমি হয়তো আমাকে কখনও আর দেখতেই পাবে না, অথবা আমি হয়তো কখনও তোমাকে চিঠিও লিখতে পারব না। কিন্তু ভরসা রেখ, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়ে থাকবে, আমার মনে, আমার স্বপ্নে থাকবে। যদি এই জীবনে সম্ভব না হয়, তাহলে পরের জীবনে তোমার সঙ্গেই থাকব আমি। আমি তোমার অন্তরে থাকা নারীত্বকে ভালবাসি, তোমার আত্মার সঙ্গে আমার প্রেম। তুমিই আমার জীবনে প্রথম প্রেম।"

১৯৩৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর অস্ট্রিয়ার বাদগাস্তিনে দুজনের গোপনে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এমিলিকে সুভাষ 'বাঘিনী' বলে ডাকতেন। এই কাহিনী অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। 'আ ট্রু লাভ স্টোরি - এমিলি এন্ড সুভাষ' এই বইয়ে দুজনের প্রেমজ সম্পর্কের অজানা তথ্য লেখা আছে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ - এই প্রায় ১২ বছর একসাথে কাটিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের ২৯ নভেম্বর জন্ম নেন তাঁর মেয়ে অনিতা।

১৯৪২ এ শেষ বার ভিয়েনায় দেখতে গিয়েছিলেন মেয়েকে, তারপর আর তিনি ফিরে আসেননি, তাদের কাছে।

এমিলি ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। টেলিগ্রাফ অফিসে চাকরি করে মেয়েকে জার্মানীর প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বানিয়েছেন।

কর্মজীবন(এই কর্মজীবন নিতান্তই সংক্ষিপ্ত)

বিদেশ থেকে কলকাতায় ফিরে দেশ সেবার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। ভারতে এসে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যেভাবেই হোক দেশকে পরাধীনতার শিকল থেকে বের করে এনে স্বাধীন করা। এখানে এসেই মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন । এইসব দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেশগৌরব উপাধি দেন। তারপর তিনি কলকাতার মেয়র হন, মেয়র হয়ে অনেক গঠনমূলক কাজকর্ম করেন।

কিন্তু পরবর্তীতে দলের সাথে মতভেদের কারণে তিনি আলাদা ভাবে ' নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পর সুভাষকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হলে ফরোয়ার্ড ব্লক দলের প্রতি মনোযোগ দিলেন। এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা আনা। এই সময় ওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে সত্যাগ্রহের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কারাবাসে তাঁর শরীর ভেঙে যায়। কারাবাসে অনশন করায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় জেল থেকে। কিন্তু মুক্তি দিলেও ১৯৪০ সালে গৃহে ব্রিটিশদের নজরে বন্দী করে রাখা হয়। কলকাতায় এলগিন রোডে তখন থাকতেন। এরপর কলকাতার জিয়াউদ্দিন ছদ্মনামে তার ভাইপো শিশির বসুর সাথে বাড়ি থেকে ছদ্মবেশে পালিয়ে আফগানিস্তান হয়ে জার্মানিতে যান। ১৯৪২ সালে বার্লিনে আজাদ হিন্দুস্তান বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন । সেখানে তাঁকে বন্দী করা হয়। জার্মানিতে বন্দী সেনাদল প্রথম "নেতাজি" আখ্যায় ভূষিত করেন। জার্মানি ও জাপানে সাহায্যের আবেদন জানান। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আসেন। সেখানে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' প্রতিষ্ঠা করেন। এতে সৈন ছিল ৫৫ হাজার। এই বাহিনীর মূল স্লোগান ছিল, " জয়হিন্দ দিল্ল চলো "। এই বাহিনী নিয়ে সোজা চলে যান বার্মায়। যা এখন পরিচিত মায়ানমার হিসেবে। এখানে পৌঁছেয় তিনি তাঁর বিখ্যাত স্লোগান দেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব'।

সিঙ্গাপুর থেকে এক সপ্তাহ পর 16th August 1945 এ ব্যংকক পৌঁছান। সেখানে তিনি জাপানের প্রতিনিধি জাপানের প্রতিনিধি হেচিয়া তেরু হো র সাথে মিটিং করেন। এই মিটিং এর পর তিনি অশান্ত ছিলেন।

মৃত্যু

মিটিং এর পর দিন Indian National Army র বিমানে চড়ে ভিয়েতনামের হো-চি-মিনহা শহরে যান। তাঁর সাথে ছিলেন এ এস আই আর, কর্নেল প্রীতম সিং, দেবনাথ গুজরাল সিং, রহমান এবং আবির হোসেন। এই শহরে আরও একটি প্লেন অবতারণ করেছিল, জাপানি লেফটেন্যান্ট ইসোবাকার। এই প্লেনে ওঠার জন্য ইসোবাকা নেতাজীকে প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবে নেতাজি রাজি হয়ে যান। নেতাজীর সাথে সঙ্গী ছিলেন কর্নেল হাবিবুর রহমান। এই প্লেন যখন তাইপিন থেকে রওনা দেয়, তখন KI21 এর left engine আলাদা হয়ে মাটিতে আছাড় খায়। নেতাজি আগুনে ঝলসে যান। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই হাসপাতালে মারা যান।

তবে মৃত্যু সম্পর্কে রয়েছে অনেক মতবিরোধ। কেউ বলেন ১৯৪৫ সালের ১৮ অগাস্ট তাইপেইতে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিখোঁজ হন। এরপর তিনটি তদন্ত কমিটি তৈরি হয়। যার মধ্যে দুটি কমিটি জানান, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি মারা গিয়েছিলেন। আর এক কমিটি জানায় নেতাজি বেঁচে আছেন। অনেকে আবার বলেন ইংরেজরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেন। তবে নেতাজীর মেয়ে বলেন, "'আধুনিক প্রযুক্তি সুযোগ দেয় অত্যাধুনিক ডিএনএ পরীক্ষার। তবে তার জন্য দেহাবশেষ থেকেই ডিএনএ সংগ্রহ করতে হবে। যাঁরা এখনও সংশয় প্রকাশ করেন যে নেতাজি ১৯৪৫ সালের ১৮ অগাস্ট প্রয়াত হননি, তাঁদের সামনে এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ রাখার সুযোগ আসবে যে টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত দেহাবশেষ প্রকৃতপক্ষে নেতাজিরই।''

নেতাজীকে নিয়ে অনেক মত বিরোধ দেখা যায়। আজ থেকে প্রায় এত বছর হয়ে গেল, এখনও তাঁর মৃত্যু রহস্যের সমাধান হয়নি। এই বীর মানুষটি দেশের জন্য যা করে গিয়েছেন, তার বর্ণনা করা এই কয়েকটি শব্দে বৃথা। তার জীবন বৃত্তান্ত কীর্তিকলাপ লিখতে গেলে তিন চারটে উপন্যাস বই বা তারও বেশি লেখার সমান হয়ে যাবে। আমরা কখনোই নেতাজীকে ভুলতে পারব না। তাই তো তাঁকে স্মরণ করতে আমরা নানারকম স্মৃতি তুলে ধরি, নেতাজীর জন্মদিনে নানাবিধ আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনের ব্যবহৃত জিনিসের স্বাদ নিতে ঘুরে আসুন এই জায়গায়

ওড়িশার কটক(যেখানে সুভাষচন্দ্র জন্মেছিলেন), সুভাষ গ্রাম (যেখানে সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস), নেতাজী ভবন (যেখানে রয়েছে সুভাষচন্দ্রের ব্যবহৃত জিনিসপত্র)।

উল্লেখ্যযোগ্য তথ্য

- নেতাজী জার্মানিতে আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' থেকে আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় সঙ্গীত শুভ সুখ চৈন কী বরখা বরষে ভারত ভাগ হৈ জাগা' তৈরি করা হল।
- সুভাষের সেজ দাদা সুরেশ চন্দ্র বসুর দ্বিতীয়া কন্যা ইলাদেবী সুভাষকে রাঙা কাকু বলে ডাকতেন।
- অবিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।
- সুভাষচন্দ্র খেতে ভালোবাসতেন চপ মুড়ি, বেগুিন, পেঁয়াজি। এই খেতে খেতেই জমে উঠত তর্ক। যে দোকানে এই খাবার খেতেন, সেই দোকানে নেতাজীর জন্মদিনে প্রতি বছর ফ্রিতে তেলেভাজা বিলি করে থাকে। দোকানটির নাম লক্ষ্মী নারায়ণ শ অ্যান্ড সন্স।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাসের দেশ' নাটকটি নেতাজীর নামেই উৎসর্গ করা।
- নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারী রাষ্ট্রীয় ছুটি হিসেবে পালিত হয়।
- ভবানীপুরে তাঁর নামে মেট্রো স্টেশন গঠিত হয়। যা আমাদের কাছে পরিচিত নেতাজী ভবন নামে। এই নেতাজী ভবনেই রয়েছে নেতাজীর কলকাতার বাড়ি এবং তাঁর স্মৃতি। আর তাই এখানকার সব কলেজ, রাস্তাঘাট নেতাজীর নামেই। নেতাজী নগর কলেজ, নেতাজী সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এনএসসি বোস রোড, এন এস রোড ইত্যাদি।